Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.87-93
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ত্রিপুরার নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্পে সম্প্রীতি ভাবনা

ড. প্রশান্ত দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভ. ডিগ্রি কলেজ, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:
The mutual coexistence of Tripura's Janjati community and the Bengalishas been seen in Tripura since the royal era. As a result of a long period of coexistence, there has been a cultural exchange between people of different races. A gradual mixing of cultures took place. The trend of that mixed culture is still prevalent in this state. The food list, clothing, festivals etc. of the people of Tripura bear the testimony of that tradition. The history of harmony between the people of Tripura's Janjati community and the Bengalis dates back to the Rajnya period, but the Bengalis and Janjati fratricidal riots of June 1980 tarnished the glorious cultural heritage of Tripura. As a result the separatist movement had started. But on the other side of hatred in social life shines the light of harmony. After the Partition, Bengali refugees from the other side of Bengal settled in Tripura within a few days and they adopted the soil and people of Tripura. That harmony is depicted in the stories of various storytellers of Tripura. This article focuses on the artistic value of selected stories of Tripura mixed with harmony.

Key Wards: Tripura, mutual coexistence, short story, harmony.

রাজন্য আমল থেকে ভারতবর্ষের ঈশানকোণের ছোট রাজ্য অরণ্যদুহিতা ত্রিপুরা সম্প্রীতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।উত্তরপূর্ব ভারতের অরণ্য-পাহাড় বেষ্টিত ত্রিপুরা রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। রাজ আমল থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে বহুদলে বিভক্ত জনজাতি ও বাঙালি পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। দীর্ঘ সময় পাশাপাশি অবস্থানের ফলে জাতি-জনজাতির মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময় ঘটেছে। ধীরে ধীরে ঘটেছে সংস্কৃতির মিশ্রণ। সেই মিশ্র সংস্কৃতির ধারা আজও এ রাজ্যে বহমান। ত্রিপুরার মানুষের খাদ্য তালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সে ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

ত্রিপুরারজনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ও বাঙালির মধ্যেকার সম্প্রীতির ইতিহাসরাজন্য আমল থেকে হলেও ১৯৮০সালের জুন মাসে সংঘটিত জাতি ও জনজাতিদের ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা ত্রিপুরার সেই গৌরবান্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করে তুলেছিল। যার স্মৃতি আজও আমাদের মনকে বিমর্ষ করেতুলে।আশির দশকে বিভেদকামী শক্তির কূট চক্রান্তের শিকার হয়েছিল ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ। প্রাণ হারাতে হয়েছিল জাতি ও জনজাতি উভয় আংশের মানুষের। নিরিহ মানুষের রক্তে ভিজে গিয়েছিল ত্রিপুরার সবুজ উপত্যকা। বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল মানুষের অন্তরাত্মা। ভাই-ভাইয়ের মধ্য সৃষ্টি হয়েছিল বিভেদের

দেওয়াল। রাজআমল থেকে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের যে ঐতিহ্য ত্রিপুরায় গৌরবের সঙ্গে চলে আসছিল তাতে ফাটল ধরেছিল। জাতি-জনজাতি মানুষের আপনজনের মৃত্যুর কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছিল ত্রিপুরার আকাশ বাতাস।

মূলত ভারতের স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ, ত্রিপুরার ভারতভুক্তি, রাজতন্ত্রের অবসান, গণতন্ত্রের উত্থান এবং সর্বোপরি উদ্বাস্তু জনগণের আগমনে শান্ত জুম-নির্ভর ত্রিপুরা উত্তাল হয়ে ওঠে। জনজাতিগোষ্ঠীর শান্ত জুম নির্ভর জীবন আর শান্ত হয়ে থাকেনি। বদলে গিয়েছিল ত্রিপুরার রাজনৈতিক সমীকরণ। অধিক মাত্রায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের আগমনে জনজাতিরাসখ্যালঘু হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে জনজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে এবং বাঙালি বিদ্বেষ মূলক মনোভব তৈরি হয়এবং বাঙালিদের অপসারণের লক্ষ্যে শুরু হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। যার রেশ পরবর্তী দীর্ঘ আড়াই দশকেরও বেশি সময় প্রভাব ফেলেছে।বিচ্ছিন্নতাবাদের জড় সমূলে উৎপাটন করা কতটুকু সম্ভব হয়েছে সেই বিষয়েসন্দেহ বর্তমানেও অব্যাহত। আজো যখন বিভিন্ন ক্ষুদ্র স্বার্থ কায়েমি রাজনৈতিক দলের শ্লোগান উঠে 'বাঙালি হটাও ত্রিপুরা বাঁচাও' অথবা 'দুনিয়ার বাঙালি এক হও' তখন জাতিগত সম্প্রীতির বাস্তব ভিত্তি নিয়ে আমাদের মনে সহজেই সন্দেহ দানা বাঁধে। মূলত কিছু স্বার্থান্ধ সুযোগ সন্ধানী মানুষের স্বার্থের ফলপরিণাম হল জাতি দাঙ্গা। কিন্তু সমাজ জীবনে বিদ্বেষের অপরপিঠেই জ্বলজ্বল করে জানান দেয় সম্প্রীতির আলোকশিখা।আত্মিক বন্ধেনের সরল সূত্র চূর্ণ করে দেয় জটিল ষড়যন্ত্রকে। আমরা দেখিওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালি ত্রিপুরায় বসবাস শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই তাদের আপন করে নিয়েছিলেন ত্রিপুরার মাটি ও মানুষ। তৈরি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধনের এক সরল সুন্দর জীবন প্রবাহ। সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সেই জীবনের ছায়ারূপ ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের রচনায় ভাষারূপ পেয়েছে।ত্রিপুরার বিভিন্ন গল্পকারের গল্পে সম্প্রীতির সেই সূত্র স্পষ্ট রূপে চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সম্প্রীতির ভাব মিশ্রিত ত্রিপুরার নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের শিল্প সার্থকতা বিশ্লেষণ।

কথাসাহিত্যিক বিমলসিংহের (১৯৪৮-১৯৯৮) 'বসনেরঠাকুমা' 'আলোর ঠিকানা' গল্প সংকলনের একটি অসাধারণ গল্প। গল্পকার হিসেবে তাঁকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল এই গল্পটি। বিগত শতাব্দীতে আশির দশকে ত্রিপুরার মাটিতে সংঘটিত আশির দাঙ্গা এই গল্পের পটভূমি। গল্পটি একদিকে যেমনআশির দশকেরলজ্জাকর রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের টুকরো আলেক্ষ্যের ছায়ারুপ অন্যদিকে গল্পের শেষে লেখক পাঠককে আসাপ্রদায়িক এক মানবিক অনুভবে উত্তির্ণ করেছেন।ত্রিপুরার বাঙালি ও জনজাতিদের মৈত্রী-সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন এই গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। 'বসনের ঠাকুরমা' মূলত ললিত রূপিনের ছেলে বসন অর্থাৎ বাঁশীরাম ও পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু সুরেন দাসের বৃদ্ধ মা, এই দুই অসম বয়সী মানবাত্মার নিঃস্বার্থ মানবিক সম্পর্কের গল্প।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার নিকটবর্তী বড়মুড়া পাহাড়ের কোলে লালিত মংকুরুই গ্রামটি জনজাতি ও বাঙালি উভয় অংশের মানুষের সুখ-দুঃখময় এক বিচিত্র কলরবে মুখর। এলোমেলো টিলার গায়ে প্রকৃতির লীলাময়তায় এই মংকুরুই সাধুপাড়া গ্রামটির অবস্থান। ছিন্নমূল কয়েকটি জনজাতি পরিবার ও পূর্ব-বাংলা থেকে আগত কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবারের পরিপূরক সহবস্থান এই গ্রামে। "দেশান্তরী, জমিহারা মানুষ অরণ্যের কোল সাফ করে জীবনের এক নূতন ঠিকানার সন্ধানে এখানে জড়ো।"[১] দৈনন্দিন জীবনযাত্রার

নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আদান-প্রদানে তাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিধারা প্রবাহিত হয়। আভাব-অনটনে পরস্পরের হাত ধরেই তাদের পথ চলা।

উদ্বাস্তু জীবনে ব্যতিব্যস্ত সুরেন দাসের পরিবার দশ বছর আগে এই গ্রামে বসবাস শুরু করে। যদিও পনের বছর আগেই সুরেন, তার মা ও পরিবারের সাবাইকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়েছিল। এই দেশে এসে নিরন্তর কঠিন সংগ্রাম করে তাদের সংসার চলছে। বাঁচার তাগিদে পূর্বের জীবন ও জীবিকা ভুলে গিয়ে তারা আজ জীবনের নতুন রসদ সন্ধানে দিশেহারা। ফেলে আসা সোনালী দিনগুলি আজ তাদের কাছে অতীত স্মৃতি মাত্র। তবু বাঁচার তাগিদে পাথর, পাহাড় এবং অরণ্যের সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করে তাদের সংসার চলছে।অন্যদিকে অস্তিত্বের তাগিদে জিরানিয়া থেকে এই মংকুরুই গ্রামে আসে ললিত রূপিনী।

গল্পের আখ্যানে দেশভাগের স্মৃতি রোমন্থন প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও আপন সত্তায় তীব্র দহন জ্বালা বহন করে চলেছে সুরেন দাসের পরিবার। আত্মীয়স্বজনকে হারিয়ে আজ প্রতিবেশী আদিবাসী পরিবারের সাথে সুরেন দাসের পরিবারের আদান-প্রদানের নতুনসমীকরণ চলে। সেই সমীকরণের সূত্র ধরে সুরেনের মায়ের সাথে পাশের বাড়ির ললিত রুপিনীর ছেলে বাশীরামের স্নেহ মাখা এক হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠে। যে সম্পর্কের নিরেট বুননে দাঁড়িয়ে আছে এই গল্পের প্লট। দুটি নিম্নবিত্ত পরিবারের পরিপূরক সহবস্থান, নিরন্তর পথচলা ও সংগ্রামের বাস্তব চিত্র গল্পটিতে ফুটে ওঠে। যে সহবস্থানে এক নিস্বার্থ মানবিক সম্পর্কের ইতিহাস রচিত হয়। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির জীবনধারায় অভ্যস্থ পরিবার দুটির মানবিক সম্পর্কের রসায়ন সূত্র আমাদের কাছে ধরা দেয়।

কালক্রমে সময়ের স্রোতে স্বদেশ বিচ্ছিন্ন চিন্নমূল সুরেন দাসের পরিবারের সাথে আদিবাসী ললিত রুপিনির পরিবার এক হয়ে গেছে। তথকথিত সংকীর্ণতা থেকে বেড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া ভেঙে তারা একে অপরের আপনজন হয়ে ওঠে। এভাবেই নিজেদের অজান্তে সুরেন দাসের মা ও ললিত রুপিনির ছেলে বসনের মধ্যে এক সখ্য ভাব তৈরি হয়। যে সম্পর্কের 'স্নেহ কাতর কোন এক দুর্বল মুহূর্তে বাঁশী এই পরিবারের আপনজন হয়ে গেলো। সে সন তারিখ কেউ মনে রাখেনি'।[২] তাই সবাই বাঁশীকে তাদের পরিবারে একজন হিসেবেই গণ্য করে— "সুরেন দাসের ঘরে বৌ, বাচ্চা, আর মাকে নিয়ে সবশুদ্ধ আটজন। লোকেও গুনে আট বাঁশী মানে ওই পাহাড়ী শিশুটা, ওকে নিয়ে বাড়ীর লোকে গুণে ন'জন।"[৩]

বসনের সঙ্গে তার ঠাকুরমার মানসিক সম্পর্ক যেন নীরেট বুননে গাঁথা। যেখানে সহজেই আবিষ্কৃত হয় প্রাণের গভীর আবেগ। সেই সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে নিশ্চিন্ত দৃঢ় বিশ্বাস। দৃশ্যমান টুকরো টুকরো ছবি, যা এই সম্পর্ককে রাঙিয়ে তুলে— "সবাই যখন কাজে যায় বাঁশীর মা বাঁশীকে সুরেন দাসের মায়ের কাছে রেখে যায়। বাঁশী যখন হামাগুড়ি দিতে শিখে তখন থেকেই বুড়ী ওকে কোলে পিঠে মানুষ করেছে। সুরেন, সুরেনের বৌ, ছেলে তারাও যায় বর্ডার রোডের কাজে। শুধু বুড়ীটা ঘর পাহারা দিয়ে বসে থাকে পাহাড়ী নাতিটা কোলে নিয়ে ।"[৪] বসনের প্রতি তার ঠাকুরমার স্নেহপূর্ণ আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মাতৃত্বের সরল অনুভূতি— "ওই পাহাড়ী ছেলেটা বুড়ীর কোল দখল করেছে। যদিবা কেউ বুড়ির কোল ঘেষতে চায়, ঠোঁট বাঁকিয়ে, গাল ফুলিয়ে ধূলোর উপর গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদে বসন।"[৫] দুই দিক থেকেই সেই অবেগ প্রতিফলিত। বুড়ীর কোলে যেন একমাত্র বাঁশীর অধিকার। নিজের খুশি মত এই কোলেই তার স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা। বুড়ীর কোলে সে জন্মগত দখল স্বত্বের মতো মালিকানা বসিয়েছে। বসনের আধো-আধো মুখে 'টামমা' উচ্চারণে সুরেনের মায়ের মনে সঞ্চারিত হতো দুর্বোধ্য এক মমতাময় টান। ছাগলের সিম গাছ

খওয়া নিয়ে দুই পরিবারে বিবাদে বসন ও তার ঠাকুরমার সাময়িক বিচ্ছেদ তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার করে তুলে। "দুর্বার টানে শিশুর বুক মোচরে উঠে। দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় চিৎকার তুলে হঠাৎ সাপের ছোবল খাওয়া আর্তনাদের মতো"[৬] ঠাকুরমার কাছে যাওয়ার জন্য ছটফট করে তার মন— "খাঁচায় পাখি থাকে; সংগীত কেউ খাঁচায় বেঁধে রাখতে পারে না। পাখির মত শিশু মায়ের পিঠে বন্দী। পাশের ঘরে টামমার নরম কোলের অদৃশ্য হাতছানি তার মনটাকে দূরন্ত সংগীতের মতো নিয়ে গেছে।"[৭] বসনের সাথে তার ঠাকুমার মনের টান সুমধুর সঙ্গীতের মতো আমাদের কানে অনুরনিত হয়। মাতৃত্ব স্বরূপ অমায়িক হৃদয়ানুভতি আমাদের মনে দোলা দেয়। মননে পালিত নিঃশব্দ নিরালম্বর সেই চাওয়া পাওয়ার সূত্র থেকে বেড়িয়ে আসে আবেগের এক একটি সমীকরণ।

শুধু বসন ও তার ঠাকুরমার অন্তরের মিলের আকর্ষণ নয়, একসাথে বসবাসের সুবাদে পরিবার দু'টির মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের সমবেত সুর গড়ে উঠে। খদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি জীবনের নানা ক্ষত্রে সেই মিলনের সুর ধ্বনিত হয়। ঝগড়া-বিবাদের পর সহজে যেমন তাদের মধ্যে মিল হয় তেমনি সঙ্কটের মুহুর্তে তারা একে অপরের আপনজন হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রের মতো এক শ্রেণি স্বার্থমগ্ন দালালের স্বার্থ চরিতার্থতায় সৃষ্ট দাঙ্গা তাদের মনোবৃত্তিকে বিষাক্ত করে তুলতে পারেনি। দুঃসময়েও তাদের মধ্যে মিল বিদ্যমান ছিল। উত্তপ্ত দিনগুলিতে তারা একে অপরের অংশীদার। চূড়ান্ত দুর্যোগের সময়েও বসনের একমাত্র আশ্রয় স্থল তার ঠাকুরমার কোল। "পূর্ব পশ্চিম দু'দিকে আগুন জ্বলছে। দুম দাম গুলির শব্দ না বাঁশ ফাটা শব্দ কে জানে। আতঙ্কে বসন আরো জোরে বুড়ীর গলা জড়িয়ে জাপটে ধরে।"[৮] সেখানেই সে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়— "সেখানেই সে পায় বাঁচার রক্ষার দৃঢ় অথচ উষ্ণ আশ্বাস।"[৯] ঠামমার দিক দিয়েও সেই একই আবেগ বিদ্যমান। একদিকে তার নিজের জীবন অন্যদিকে বসন। দাঙ্গার ফলে ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় মানুষদের সহ্য করতে হয়েছে তিক্ত যন্ত্রণা। তাইযন্ত্রণাবিদ্ধ মন বার বার উত্তর খোঁজে— কোন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য এই দাঙ্গা? সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের স্মৃতি রোমন্থনে বার বার আমাদের প্রাণ আহত হয়। নিঃষ্পাপ প্রাণের উপর দাঙ্গা বয়ে আনে অশান্তির কালো মেঘ। যার আগ্রাসন থেকে মুক্ত হতে পারেনি বসন ও তার ঠাকুরমা। 'হিংস্র নেকড়ে বাহিনীর লোলুপ চাহনি'র অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হয়েছেএই দুটি নিস্পাপ প্রাণ।

'বসনের ঠাকুরমা' গল্পে বসন ও তার ঠাকুরমা স্বার্থান্ধতার চক্রবূহ থেকে বেড়িয়ে আসতে না পারলেও সাম্প্রদায়িকতার বেড়া ভেঙে তাদের উত্তরণ ঘটে মানবিকতার স্বর্গরাজ্যে। গল্পের পরিসমাপ্তিতে অঙ্কিত মৃত্যু দৃশ্য আমাদের বাকরুদ্ধ করে তোলে—"তিন দিন পরে পুলিশ কুশবনে খালের ধারে আবিষ্কার করলো দুটো মৃতদেহ। বুড়ীর বুক আলিঙ্গন আবদ্ধ পাহাড়ী শিশুটা। একটা বর্ষায় একসাথে গেথে রয়েছে দুটি মানুষ।"[১০] এই দৃশ্যে লেখক মানবিকতা হননের এক অপঠিত পৃষ্ঠার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। নি:ষ্পাপ দুটি প্রাণের বলিতে আমাদের মর্মচক্ষুর সাম্প্রদায়িক পর্দা সরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মানবিক মুখ। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যত গল্প বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে বিমল সিংহের 'বসনের ঠাকুমা' তাদের মধ্যে অন্যতম। এই গল্পে লেখক মানুষের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে সম্প্রীতির কথা বলেছেন। সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিকে ছাপিয়ে অন্তরের নিত্যধর্ম এই গল্পে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। সাম্প্রদায়িক মোহান্ধতার অসারতাকে তুলে ধরে লেখক মূলত মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মানব হৃদয়ের স্নেহ-বাৎসল্য, প্রীতি-মমতা ইত্যাদি বৃত্তিগুলিই এই গল্পে সম্প্রীতিবোধের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে।

ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্পের প্রাণপুরুষ বিমল চৌধুরীর (১৯২২-২০০১) 'ত্রিপুরা ৮০' গল্পেও আশি সালের দাঙ্গার পটভূমিকায় বাঙালি সুদামের সঙ্গে আদিবাসী পুংখিরাই-এর বন্ধুত্বের সমর্ককে তুলে ধরে সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। একসঙ্গে বড় হয়ে উঠা সুদাম ও পুংখিরাম জাতিগত ভাবে আলাদা হলেও হৃদয় ধর্মে তাদের একাত্মতা ত্রিপুরার চিরাচরিত ঐতিহ্যকেই নির্দেশ করে। ত্রিপুরায় বসবাসকারী জাতি-জনজাতির স্পম্প্রীতির সুর ধ্বনিত হয় এই গল্পে। জাতিগতভাবে আলাদা হয়েও মানবিকতার টানে দুর্যোগের সময় পাশে থেকে সাহায্যের হাত বারিয়ে দেওয়ার শুভচেতনা এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

গল্পে আমরা দেখি দাঙ্গার কারণে সুদাম বৃদ্ধ মায়ের হাত ধরে চড়িলামের মঙ্গলছড়া পাড়া ছেড়ে সরকারিত্রাণ-শিবিরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। কিন্তু পথে ধারালো অস্ত্রধারী দুই যুবক তাদের পথ আটকালে পুংখিরাম সুদামকে রক্ষা করে। আবার অন্যদিকে সুদাম এগিয়ে যেতে যেতে দেখে পুংখিরাম নিজেই বিপদগ্রস্ত। সুদামের বিপদে পুংখিরাম যেমন নিজের জীবন দিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছিল তেমনি সুদামও পুংখিরামের বিপদের কথা ভেবে নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি। অশুভ শক্তির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আহত মৃতপ্রায় পুংখিরামকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছায়। নিজের রক্ত দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলে। দাঙ্গাকারীদের চক্রান্ত তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে বিষাক্ত করতে পারেনি। গল্পটিতে জাতি-জনজাতির পারস্পরিক সহবস্থানের চিত্র আঞ্চলিক ভষা প্রয়োগের সবলীলতায় শিল্পস্বার্থক হয়ে ওঠেছে।

নিলিপ পোদ্দারের(১৯৪৭ খ্রি:) একটি অসামান্য গল্প 'লংতরাই পাহাড়ে সূর্যোদয়'ত্রিপুরার প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের সমন্বয় ভাবনার পরিচায়ক। ত্রিপুরার মাটি ও মানুষ পরিচিত পরিসরে নিলিপ পোদ্দারের গল্পে ধরা দেয়। কোনো কাল্পনিক আখ্যান নয় তাঁর গল্পের চরিত্রেরা আমাদের চেনা জগতের বাসিন্দা। 'লংতরাই পাহাড়ে সূর্যোদয়' গল্পটি তাঁর 'সাঁঝবেলা ডটকম' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প। গল্পের পটভূমি ত্রিপুরার ইতিহাসের কালো অধ্যায়। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা এই গল্পের উপজীব্য।

'লংতরাই পাহাড়ে সূর্যোদয়' গল্পের মূল চরিত্র অর্ক সেন। ৮০-র দাঙ্গায় মান্দাইয়ে উদ্ধারকারী দল তাকে উদ্ধার করেছিল। পরবর্তী সময় হোমে প্রতিপালিত হয়ে অঙ্কে অনার্স নিয়ে পাশ করে লংতরাই এর পাদদেশ ছৈলেংটা দ্বাদশেচাকরি পায়। লংতরাইয়ের জয়চন্দ্র রোয়াজা পাড়ায় প্রতিটি টংঘরে অর্ক 'ছোটমাস্টার' হিসেবে পরিচিত। রোয়াজা পাড়ার সর্দার বিনন্দ রোয়াজা অর্কের কাছের বন্ধু। পাহাড়ি জনপদ আর এই সহজ সরল গিরিবাসীরা অর্কের একান্ত আপনজন। এই দিন রাতে 'ফ্রিডম ফাইটার' নামধারী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অর্ককে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চাইলে বিনন্দ চিৎকার করতে থাকে—"ছোট মাস্টাররে লইয়া যাইতাছে গা, সবাই ওঠো জাগো।"[১১] বিনন্দের চিৎকারে কাছে দূরে সারা পাহাড়ে জ্বলে উঠে মশাল। গুলি চালিয়েও ছত্রভঙ্গ করা যায়নি জয়চন্দ্র রোয়াজা পাড়ার নারী-পুরুষদের। চতুর্দিকে মশাল হাতে এগিয়ে আসতে দেখে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পালিয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। এই গল্পে লেখক ত্রিপুরার জাতি-জনজাতিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিশ্বাসের চিত্র অঙ্কন করেছেন। স্বধীনতার নামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অশান্তির বার্তাকে নস্যাৎ করে লংতরাই পাহাড়ে রোয়াজা পাড়ায় যে প্রতিবাদের মশাল জ্বলে উঠেছিল তা সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করে।

গল্পকার দেবব্রত দেবের(জন্ম-১৯৫৭) 'ওকোকিলবাসি,বৃক্ষটি!' জাতি-জনজাতির আত্মিক সম্পর্কের গল্প। বিগত শতাব্দীতে আশির দশকে ত্রিপুরার মাটিতে সংঘটিত আশির দাঙ্গার পটভূমিতে গল্পটি লেখা

হয়েছে। স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ মানবিক সত্তা কীভাবে সম্প্রদায়ের বেড়া ভেঙে মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে তাই এই গল্পের মূল বিষয়। পুলিশ অফিসার হিমাদ্রিশঙ্কর বাবুর অতীতচারিতার মাধ্যমে গল্পটির উপস্থাপন ভঙ্গিতে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক হিংসা ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকলেও মানবিকতা সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে।কোকিলবাসির মাতৃসত্তাকে লেখক বৃক্ষের ভাব কল্পনায় মিলিয়ে গল্পটিকে অন্যমাত্রার করে তুলেছেন।

রামধন মালাকার ও তাঁর স্ত্রী কোকিলবাসিদেশভাগের শিকার হয়ে আপন পরিবারের মানুষজন ও একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে উদ্বাস্তু হিসেবে এপারে আশ্রয় নেয়। আঠারোকার্ডে জনজাতি এলাকায় তাদের জীবনে ছিল পারস্পরিক সহবস্থান। প্রতিবেশী সাধনহরি দেববর্মার রুগ্ন ছেলেকে আপন ছেলের মতো লালন পালন করতো কোকিলবাসি। আদরকরে কোকিলবাসি ছেলের নাম রেখেছিল হারাধন। এভাবে ভালই চলছিল তাদের দিন। কিন্তু ইদানিং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। "কোথায় যেন কী সব হয়েছে। হচ্ছে। কারা যেন আসবে, আসছে। থেকে থেকে একটা জিগির উঠছে চারপাশে— আইয়ে রে, আইয়ে রে! রামধন প্রতিদিন ভেবেছে—আইয়ে তো আপনা মাইন্ষে! তয় ডর কী?"[১২] কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামধন 'আপনা মাইন্ষে'র ধারণা পাল্টে যায়। রাতেই সে পালিয়ে যাওয়ার সংকল্প করে। কিন্তু ঘরে শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল হারাধন। তাকে রেখেই চলে যাওয়ার কথা বললে কোকিলবাসি বলে—"কী কও তুমি ! পুলাডারে এক্লা-অস্বর ঘুমো রাইখ্যা।"[১৩] এই দুর্যোগের দিনে কোকিলবাসি হারাধনকে একা ছেড়ে যেতে পারেনি। নিজের জীবনের চিন্তা না করে সে ঘুমন্ত হারধনকে কোলে করে রওনা দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পুলিশ অফিসার হিমাদ্রিশঙ্কর কোকিলবাসির দেহ আবিষ্কার করে স্তম্ভিত। কারণ শবদেহের দুই পায়ের মাঝখানে শাড়ির ঢাকনার অন্তরাল থেকে পাওয়া যায় বছর তিন-টিনের এক জীবিত তিপ্রা ছেলেকে। মৃত্যুর পরও কোকিলবাসি যেন হারাধনকে আগলে রেখেছে। বর্শাবিদ্ধকোকিলবাসির লাশ—"দুচোখ পরিপূর্ণ খোলা। পিতলবর্ণ হয়ে গেছে চোখের মণিদুটো। তবুও বুঝি অবিরল গড়াচ্ছে স্নেহ, মায়া, তীব্র মমতা। থমকে গেছে সহসা। তবুও অতি অবিনশ্বর, অবিরাম।"[১৪] এই গল্পেকোকিল ও হারধনের আত্মিক যোগসূত্র রচনা করে এক স্নেহাদ্র সম্প্রীতির ইতিহাস। যে ইতিহাসে নিহিত স্নেহ-মমতাপূর্ণ নি:স্বার্থ মানবিক রূপের স্বরূপে আমরা বিস্মিত।

ত্রিপুরার জনজাতি ও বাঙালি উভয় জনগোষ্ঠীর সম্প্রীতির প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। রাজনৈতিক কূটচক্রেতা বিনষ্ট হয়ে এক সময় ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। প্রগতিশীল লেখক তথা গল্পকারদের 'বসনের ঠাকুরমা', 'ত্রিপুরা-৮০','লংতরাই পাহাড়ে সূর্যোদয়', 'ও কোকিলবাসি, বৃক্ষটি!', ইত্যাদি গল্প আমাদের সেই অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে এসে আলোর দিকে যাত্রার পথ দেখায়। গল্পগুলি তাঁদের প্রগতিশীল শিল্পী মনের পরিচায়ক। মানব হৃদয়ের যে আত্মিক যোগসূত্র গল্পগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় তা মানবিক সম্পর্কের এক অনন্য দলিল।

তথ্য সূত্র:

[১] বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ, ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯,পৃ: ৪৩।

[২] ঐ,পৃঃ ৩৬।

[৩] ঐ, পৃঃ ৩৬।

[৪] ঐ,পৃঃ ৩৬।

[৫] ঐ, পৃঃ ৩৭।
[৬] ঐ, পৃঃ ৪১।
[৭] ঐ, পৃঃ ৪১।
[৮] ঐ, পৃঃ ৪৮।
[৯] ঐ, পৃঃ ৪৯।
[১০] ঐ, পৃঃ ৪৯।
[১১] 'লংতরাই পাহাড়ে সূর্যোদয়', নিলিপ পোদ্দার, পৌণমী প্রকাশন,প্রথম প্রকাশ ২০১৫,পৃ: ১৩।
[১২] 'ও কোকিলবাসি, বৃক্ষটি!', দেবব্রত দেব, অক্ষর পাব্লিকেশানস্, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, পৃ: ৩১।
[১৩] ঐ, পৃ: ৩২।
[১৪] ঐ, পৃ: ২৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) ঘোষ রাজীব(সম্পাদনা), ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্প, বুক অয়ার্ল্ড, প্রথম প্রকাশ : ২০১৯।
২) দাশ নির্মল, উত্তরপূর্বের বাঙালা ছোটগল্প বীক্ষণ : এক (পর্ব ত্রিপুরা), অক্ষর পাব্লিকেশানস্, প্রথম প্রকাশ : ২০১২।
৩) দাশ নির্মল, দত্ত রমাপ্রসাদ(সম্পাদনা), শতাব্দীর ত্রিপুরা, অক্ষর পাব্লিকেশানস্, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।
৪) দত্ত রমাপ্রসাদ, রায় ব্রজগোপাল, ত্রিপুরায় শতাব্দীর প্রবন্ধ চর্চা, ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ২০০৪।
৫) দাস সুস্মিতা, সাক্ষাৎ ২৫, স্রোত প্রকাশনা, প্রকাশ কাল : ২০১৮।
৬) দেবনাথ মৃণালকান্তি, ত্রিপুরার কথাসাহিত্য : নানা প্রসঙ্গ, তুলসী পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ : ২০১৬।
৭) বন্দ্যোপাধ্যায় সুরভি, গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০।
৮) সিংহ শিশির কুমার, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অক্ষর পাব্লিকেশানস্, প্রথম প্রকাশ : ২০১৮।

পত্র/পত্রিকা:

১) চক্রবর্তী কল্যাণব্রত(সম্পাদনা), ভাষাসাহিত্য-৮, বিশেষ গল্পসংখ্যা, মার্চ, ২০১৮, নতুনপল্লী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।
২) চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত(সম্পাদনা), পরিকথা, ষোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে, ২০১৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

অভিধান/কোষ গ্রন্থ:

১) সরকার পবিত্র, ব্যাবহারিক বাংলা বানান অভিধান, লতিকা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ২০১৮।